সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

# মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নগর : চর্যাপদে ও অন্নদামঙ্গলে

মোহাম্মদ আবু জাফর*

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ[১] ॥

ক্ষৌরকর্মকল্যাণে মুণ্ডিতমস্তক জনৈক তরুণ নেড়ে বামুনের বাস কোন এক নগরে, কিন্তু মন তার বিষয়-বাসনা-বঞ্চিত নয়, নয় সে নাগরালিতে পিছপা। সে কারণে, ডোম্বি এক যুবতী এবং তার মধ্যে নিত্য আসা-যাওয়া। কিন্তু নাগর তাকে না রাখে বা রাখতে পারে নিজের কাছে অথবা নগরের অন্য কোথাও— এমনই সমাজ ব্যবস্থা। বর্ণশাসিত এবং পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিভূ কাহ্নপা তাই বোধ করি বলেছেন : 'ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ'; যেন, নেড়ে বামুনই দাঁড়িয়ে থাকে বাসনাবর্জিত হয়ে, আর প্রগলভা ডোম্বি তাকে স্পর্শ করে করে যায়। অর্থাৎ ফলের ভাগী বামুন, পাপের ভাগী ডোম্বি। বলা বাহুল্য, এটা সঙ্গতিপূর্ণ সেকালের এবং পরবর্তীকালে অব্যাহত সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গে[২]। তারুণ্যে ডোম্বি-সংসর্গ দুঃসাহসের ব্যাপার, দক্ষতারও ব্যাপার এবং তা অর্জনের জন্যে উক্ত তরুণকে নিশ্চয়ই আত্মপ্রশিক্ষিত হতে হয়েছে। অনুমিত হয়, সে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে হয়েছে তারই পরিচিত জনা কয়েক পুরসুন্দরীকেই। বাৎস্যায়নের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন যে, তৃতীয়-চতুর্থ শতকে সদাগরী বাণিজ্যলব্ধ ধনে সমৃদ্ধ বাঙলার নগরগুলোতে বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* 'নাগর যুবক-যুবতীদের অনুশীলন-গ্রন্থ' ছিলো। 'গৌড়ের নগরপুষ্ট অবসরসমৃদ্ধ' নরনারীরা 'কামলীলা ও ঐশ্বর্যবিলাসের' মধ্যে ছিলো নিমগ্ন। 'গৌড় নাগরেকরা যে লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন যুবতীদের মনোহরণ করিবার জন্য, তাহাও বাৎস্যায়ন লিখিয়া যাইতে ভুলেন নাই। গৌড় ও বঙ্গের রাজপ্রাসাদান্তঃপুরের নারীরা প্রাসাদের ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী, ভৃত্য ও দাসদের সঙ্গে কিরূপ লজ্জাকর কামষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার সাক্ষ্যও বাৎস্যায়ন দিতেছেন। নাগর অভিজাত শ্রেণীর অবসর এবং স্বল্পায়াসলব্ধ ধনপ্রাচুর্য তাহাদিগকে ঐশ্বর্য-বিলাস এবং কামলীলার চরিতার্থতার একটা বৃহৎ সুযোগ দিত;... নাগর অভিজাত সমাজে নর্তকী, সভানারী, বাররামা, দেবদাসীরা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইতেন।'[৩] এ চিত্র বাঙলার সমৃদ্ধি-কালের। কিন্তু নৈতিক ও যৌন আচরণের যে ছবি বাৎস্যায়ন এঁকে গেছেন তা অব্যবহিত পরবর্তী শতকগুলোতে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায় নি। বাৎস্যায়ন-নির্দেশিত 'সদাগরী ধনতন্ত্রে'র একপ্রকার অবসান ঘটতে থাকে সপ্তম শতক থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে 'সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের' যে অবনতি সূচিত হয় তার ফলে 'প্রাচীন বাঙলার নগরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে' বদলাতে আরম্ভ করে[৪]।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখ্য যে, 'নাড়িয়া' বলতে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুও বোঝাতে পারে[৫]। ভিক্ষুর জন্যে নারীস্পর্শ নিষিদ্ধ ছিলো। তবু বামাচারজাত নৈতিক অধঃপতনের শিকার অনেকেই হয়েছিলেন। তবে তা পরে শাস্ত্রকারদের কাছে কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠেছিলো বলে মনে হয় ; তা না হলে এতো অবলীলায় নেড়ে বামুনের বা নেড়ে ভিক্ষুর ডোম্বিপ্রীতি চর্যাগীতিভুক্ত হতো না। চর্যাপদকর্তারা গোপন ধর্মতত্ত্ব বোঝানোর জন্যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, সাহিত্য বা সমাজচিত্র আঁকা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো না। ফলে, এমন কোন উপকরণ তাঁরা ব্যবহার করেন নি যা সচরাচর দেখা যায় নি।

কবির নির্দ্বিধা বিবৃতিমতে যে ডোম্বিগমন ছিলো এক স্বাভাবিক আচরণ তার প্রধান লালনক্ষেত্র নগরই হওয়ার কথা। গ্রামে এ চর্চা দৈহিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার আশঙ্কা সৃষ্টি করে, যদিও গ্রামাঞ্চল এর আওতাবহির্ভূত সব সময় ছিলো না। বৌদ্ধ সঙ্ঘের নৈতিক মানের পতন সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন যে, প্রথম যুগের আদর্শ অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে নি, 'কতক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই সঙ্ঘের জীবনে কলুষের রেখাপাত হইল।'[৬] তিনি অবশ্য ভিক্ষুণীদেরই মূলত দায়ী করেছেন; কিন্তু এক্ষেত্রে ভিক্ষু তথা পুরুষ জাতিরই যে আগ্রহটি বেশি তা অস্বীকার করা অবাস্তব। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপে বৌদ্ধ ধর্ম পরাভূত হলেও বৌদ্ধ রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টম-নবম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়। কিন্তু শুদ্ধাচার সর্বাংশে রক্ষিত যে হয় নি, চর্যাপদধৃত চিত্র তার একটি প্রমাণ। উচ্চবর্ণ মানুষের নিকটাত্মীয় কাহ্নপা তাই অসঙ্কোচে বলেছেন : 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মই সাঙ্গ'[৭]। 'সাঙ্গ' বলতে বিধবা বিয়ের কথা বলা হয়েছে যা প্রচলিত ছিলো নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে, কাহ্নপা ঐ ধরনের বিয়েতে বেশ আগ্রহী। তিনি আরও বলেছেন :

এক সো পদমা চউসটঠী পাখুড়ী[৮]।  
তহি চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি॥  
(এক সে পদ্ম চৌষট্টি পাপড়ী।  
তায় চড়িয়া নাচে ডুম্‌নী বেচারী[৯]॥)

চৌষট্টি পাঁপড়ির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যাই থাক না কেন, ডোম্বি যে নানা নৃত্যে পটীয়সী ছিলো তা বোধগম্য। নগর-ভিত্তি ছাড়া ব্যাপক ও সূক্ষ্ম মানের নৃত্য সাধনা প্রায় অকল্পনীয়। ডোম্বি কার নায়ে আসা-যাওয়া করে, সেটি জানতেও কবি সমান উদগ্রীব। নৌকায় যে ডোম্বিকে যাতায়াত করতে হতো তাতেই অনুমিত হয় যে, নগরের চারপাশে পানিভরা গড় ছিলো। সে হেতু কাহ্নর জিজ্ঞাসা :

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।  
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ[১০]॥

উড়িষ্যা অথবা কর্ণাটকের অধিবাসী কাহ্নপা উত্তরবঙ্গের সোমপুর বিহারে, বর্তমান পাহাড়পুরে, অবস্থান করতেন সপ্তম শতকের শেষ পাদে[১১]। পাহাড়পুর বা তার কাছাকাছি কোন নগরই হয়তো তাঁর চিহ্নিত নগর। চর্যাপদে সমাজচিত্র বিষয়ে আনিসুজ্জামান যে আলোচনা করেছেন তাঁর 'স্বরূপের সন্ধানে' বইতে, তাতেও তিনি নগরটি নির্দিষ্ট করে দেন নি[১২]।

সতরো সংখ্যক পদে 'বীণা'-র এবং 'বুদ্ধ নাটক'-এর যে উল্লেখ আছে তা সাধারণভাবে নগর-সম্পৃক্ত সামগ্রী ও বিষয়[১৩]। 'গন্ধর্বনগরী'র উল্লেখ আছে একচল্লিশ সংখ্যক পদে[১৪]। আঠারো সংখ্যক পদে কাহ্ন বলেছেন :

কেহো কেহো তোহোরো বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই ॥
(কেহ কেহ তোরে মন্দ বলে।
বিদ্বজ্জন লোক তোকে কণ্ঠ থেকে না ছাড়ে[১৫] ॥

গ্রামাঞ্চলে বিদ্বজ্জনের পক্ষে এতো অন্তরঙ্গভাবে ডোম্বিসঙ্গভোগ অকল্পনীয়। উনিশ শতকে সঙ্গীত নৃত্যে পারদর্শী বারবনিতার যে আদর ছিলো শহর কলকাতায়, তা স্মরণ করা যেতে পারে। একটি শহর সামন্ত বা বুর্জোয়া নৈতিক মানে ব্যাপকভাবে বেড়ে না উঠলে এবং সেই মানদন্ডে নাগরিকতা ও বৈদগ্ধ্য উঁচু মাত্রায় না পৌঁছালে স্ত্রীব্যতিরেক নারীসংসর্গভোগ, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর কামকলাপারদর্শিনীর নিত্যসঙ্গলাভ, একজন বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁর কণ্ঠে যে আম্রপালীরা লটকেই থাকে নিঃশঙ্কচিত্তে, এটি সম্ভব হতে পারে কেবল ঐ কাঠামোগত ও সংস্কৃতিগতভাবে উন্নত নগরেই।

একজন সাধারণ পাঠক চর্যাপদগুলোতে লোকজ জীবন-সম্পৃক্ত নানা উপকরণ পাবেন[১৬]। যেমন, ব্যাধের হরিণ শিকার, তাঁতির কাপড় বোনা, কাঠুরের কাঠ কাটা, ডোম-ডোমনীর চ্যাঙারি বোনা, গাছের চিকন ছাল থেকে মদ চোলাইকরণ, ধনুক, বাণ, টাঙ্গি, নৌকা (নাব, নাবী), ভেলা, দাঁড় (কেড়ুয়াল), গলুই (মাঙ্গ), মাস্তুল (পুলিন্দা), পিঁড়ি, হাঁড়ি, ভাঁড় (পিটা) ইত্যাদি। তাঁদের ধর্মতত্ত্ব বোঝানোর জন্যে পদকর্তারা সে কালের সমাজ জীবনের বহু উপকরণ ও ছবি ব্যবহার করেছেন তাঁদের রচনাগুলোতে। গণজীবনের নানা প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের চাইতে চর্যাপদে নগরই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। সে কালে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলো না বলে যে মন্তব্য সুকুমার সেন করেছিলেন তা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি আনিসুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বরাতে তিনি জানিয়েছেন :

> পাণিনির সময় থেকে বাংলাদেশে নগরের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ; টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্তি এবং য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে মহাস্থান সমৃদ্ধ নগর ছিল[১৭]।

পদকর্তাদের অনেকেই ছিলেন উচ্চ বর্ণের। যেমন, আর্যদেব, কঙ্কণ, ডোম্বী ও দারিক ছিলেন রাজা ; কম্বলাম্বর ও ভুসুকু রাজপুত্র; জয়নন্দী মন্ত্রী, লুইপা রাজসভার লেখক, জয়নন্দী, ধাম ও সরহ ব্রাহ্মণ ; বীণা ক্ষত্রিয়, কুক্কুরী সম্ভবত ব্রাহ্মণ, কাহ্ন কায়স্থ ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কেবল মহীধর ছিলেন শূদ্র এবং শবরী ছিলেন ব্যাধ[১৮]। শ্রেণীচরিত্রের কারণেই তাঁরা যে হবেন নগরবাসী, এটা সহজেই বোধগম্য।

শহর, সমাজ ও শাসন সম্পর্কিত নগর, নয়বল, বল (সৈন্য : ৪৮), কড়ি, বুড়ি, রথ, দোসাধি (রাজার চর) প্রভৃতির উল্লেখ চর্যাপদে আছে[১৯]। রাজার উল্লেখ আছে ৩৪ ও ৪৮ সংখ্যক পদে, শাসনপাট্টা দানের কথা আছে ৪৭ সংখ্যক পদে, রাজার সেনামণ্ডল এবং তুর্যধ্বনিসহ যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ আছে ৪৮ সংখ্যক পদে। ৪৩ সংখ্যক পদে আছে অশ্বারোহী সেনা-প্রসঙ্গ[২০]। দাবা খেলার প্রসঙ্গ আছে ১২ সংখ্যক পদে। এ সঙ্গে লক্ষ্যযোগ্য যে, চর্যাকাররা ছিলেন শিক্ষিত। সংস্কৃত,

প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষা এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ, গণিত, ন্যায়দর্শন প্রভৃতিতে তাঁরা ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলে অনুমান করা চলে। একই সঙ্গে তাঁরা অর্জন করেন অধ্যাত্ম বা পরমার্থ জ্ঞান। এঁদের সম্পর্কে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন : 'এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, সে অধিকারই তাঁদের ছিল না। এঁরা বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ বিহারে বা টোলে শিক্ষিত। নানা সূত্রে জানা যায়, নালন্দা প্রভৃতি বিহারে আট শতক থেকে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ ও তৎসম্পর্কিত যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র-বজ্র-সহজ তত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা বৃদ্ধি পায়।'[২১] একই ধারায় বিবেচ্য যে, চর্যাকাররা যেভাবে শব্দ, অলঙ্কার ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁদের দক্ষতা ও সুষ্ঠুতা প্রমাণিত হয়। বহু বছরের চর্চার ফলেই এ ধরনের প্রায় ত্রুটিহীন সফল সংক্ষিপ্ত কবিতার জন্ম হয়। ধ্বনির কারুকাজ, লোকজ জীবনের নানা উপকরণ ও চিত্রের সাহায্যে ধর্মের রহস্যময়তা প্রকাশের চেষ্টা, সঙ্গীতময়তা সৃষ্টি প্রভৃতি সব কিছুই এক ধরনের নাগরিক বৈদগ্ধ্যের ইঙ্গিত দেয়। গ্রাম্য কবিদের পক্ষে এ ধরনের পংক্তিমালা রচনা বড় সহজ নয়। একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য, গুহ্যসাধনতত্ত্ব, লোকজ জীবনের চিত্রাবলি, শব্দ ও ছন্দের পরিমিত ব্যবহার প্রভৃতি যেন একটি সমন্বিত রূপ লাভ করেছে। উপর্যুক্ত সব কিছুই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, চর্যাকাররা ছিলেন শহরবাসী; তাঁরা তাঁদের শাস্ত্র ও জীবন চর্চা শহর বা তার সংলগ্ন এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এ সব কারণে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন যে, 'চর্যাগানে গ্রামের অনুপস্থিতি যে সম্পূর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং সেই কারণেই কৃষির কথাও এখানে প্রায় নেই। টিলায় বসবাসকারী ব্যাধদের জীবনের কথা বাদ দিলে চর্যাগীতির সবটাই নগরজীবনের চিত্র। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ডোমদের বাস নগরের বাইরে হলেও নগর-সন্নিহিত স্থানেই।'[২২] চর্যাগীতি নগর-নির্ভর বলেই এতে ধনোৎপাদক শ্রেণীসমূহের কথা বেশি নেই, বরং আছে 'নানা ধর্মোপজীবীর কথা', প্রকাশ্য শিথিল নৈতিক জীবনের সংবাদ। 'চর্যার নগর অনায়াসেই ব্যবসা-কেন্দ্র হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দর হওয়াও (নৌযান ও নৌপথের বারংবার উল্লেখের জন্যে) অযৌক্তিক নয়'[২৩]; তবে চর্যার কালটি যে সব দিক থেকে অবক্ষয়ের কাল, সে কথা সবাই উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের কিছু মন্তব্য স্মর্তব্য :

> ....... আনুমানিক নবম-দশক শতক হইতে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বড় কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুরে।... সোমপুর (বর্তমান পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেই। কিন্তু... কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেরণা সর্বত্রই ছিল বলিয়া মনে হয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক নগরই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর বা সংযোগকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।... সে-সব নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, শাসনাধিষ্ঠান ছিল যে-সব নগরে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারীরা তো বাস করিতেনই—ইঁহারা সকলেই চাকুরিজীবী, ধনোৎপাদক কেহই নহেন। রাজা, মহারাজা, সামন্তরাও নগরবাসীই ছিলেন। তীর্থমহিমার জন্য বা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যে-সব নগর গড়িয়া উঠিত সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও শিক্ষার গুরু, আচার্য, পুরোহিত প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকেরা, তাঁহাদের শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতিরাও বাস করিতেন।... বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক নগরেই বাস করিতেন...। রাজকর্মচারী, ... কর্মকার, কাংসকার, শাঙ্খিক-শঙ্খকার, মালাকার, তক্ষণ-সূত্রধার, শৌণ্ডিক, তন্তুবায়-কুবিন্দক,... স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট বড় শিল্পী ও বণিকেরা, ... রজক, নাপিত, গোপ... নগরে বাস করিতেন...। ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু কিছু সমাজ-শ্রমিকদেরও নগরে বাস করিতে হইত, যেমন ডোম, চণ্ডাল, ডোলাবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ

> ইত্যাদি। কিন্তু ইঁহারা সাধারণত বাস করিতেন নগরের বাহিরে; চর্যাগীতিতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে 'ডোম্বীর কুঁড়িয়া' নগরের বাহিরে। এইসব সমাজ-সেবক ও সমাজ-শ্রমিকেরা নগরবাসী বটে, কিন্তু যথার্থত নাগরিক ইহারা নহেন; নাগরিক বলা যায় প্রধানত শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিকদের... রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং বিত্তবান ব্রাহ্মণদের[২৪]।

বস্তুত, চর্যাদপদগুলো আলোচ্য বিষয়ের একটা খনি বিশেষ ; এ-ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হওয়ারই সম্ভাবনা।

মধ্যযুগের বিদায়-শেষের কবি ভারতচন্দ্র রায় যেমন ছিলেন বিদগ্ধ তেমনি ছিলেন সমাজ ও ইতিহাস সচেতন। তাঁর অনন্য রচনায় সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তথ্যচিত্রের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। অন্যদিকে কয়েক শতাব্দীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে অগ্রগতি ঘটে তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্রের পক্ষে আরও বাস্তবসম্মতভাবে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কাব্যচর্চা সহজতর হয়। মুসলমানদের আগমন, মানবিকতার স্বীকৃতি, দৈবশক্তির মহিমাহ্রাস, জন্ম মহিমার চেয়ে কর্মমহিমার প্রমাণিত প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে চৈতন্যদেবের মতো উচ্চ বর্ণের বামুন কর্তৃক জন্মজাত ব্রাহ্মণত্বের একচেটিয়া দাবি পরিত্যাগ এবং তাঁর দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর সঙ্গে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মিলনসেতু রচনার সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি বাঙালীকে মানবতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দীক্ষিত করে, তার অনেক সুফলই ভারতচন্দ্র ভোগ করেন। সে কারণে তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহারে যেমন পিছপা হন নি, তেমনি দেবদেবীকে উপহাস করতেও হন নি দ্বিধান্বিত। সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দী-সহ নানা ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি থাকায় এবং সর্বোপরি কাব্যসৃষ্টিগুণ তাঁর আয়ত্তে থাকায় তাঁর পক্ষে এমনকি তথ্যভিত্তিক বিবরণও রসপূর্ণ রূপে উপস্থাপিত করা সহজ হয়।

সাধারণভাবে ভারতচন্দ্রকে বলা হয় নাগরিক বৈদগ্ধ্যের কবি। এর অর্থ এই নয় যে, কাব্যসৃষ্টির চাইতে নগর ও নাগরালি বর্ণনায় তিনি অধিক কালক্ষেপ করেন। আঠারো শতকের প্রায় মধ্য ভাগে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু হয় এবং ঐ শতকের প্রথম পাদ শেষ হওয়ার একরকম অব্যবহিত পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি হলেও তিনি ছিলেন একজন ভাতাভোগী লেখক এবং গ্রামেই বসবাস করতেন। এ সত্ত্বেও কোন প্রকার গ্রাম্যতা তাঁকে পেয়ে বসে নি। সে কালে মুর্শিদাবাদের পাশে নদিয়ার বড় কোন গুরুত্ব পাওয়ার কথা নয় এবং কবি সে ধরনের কোন গুরুত্ব সৃষ্টির চেষ্টাও করেন নি। তবে ভবানন্দ মজুমদার প্রসঙ্গে অথবা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী প্রসঙ্গে নগর বা নগর জাতীয় কিছু চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামরিক ও অন্যান্য কারণে বিশেষ করে রাজধানী দুর্গপ্রাকার পরিবেষ্টিত থাকতো। ভারতচন্দ্রের বাবা নরেন্দ্র রায়ও তাঁর নিজের রাজধানী পরিখাবেষ্টিত করে সুরক্ষিত করেছিলেন[২৫]। নবদ্বীপের 'সদর কাছারীতে' প্রায় দু শ কর্মচারী ছিলো; কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের ছিলো তিন হাজার অশ্বারোহী এবং সাত হাজার পদাতিক সৈন্য। ফিরিঙ্গিরাও দেশীয় জমিদারদের সৈন্যদলে কাজ করতো[২৬]। 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশে নদীয়া ও তার পার্শ্ববর্তী নগর ও স্থানের নানা বিবরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। এমনকি, 'গ্রন্থসূচনা'-য় তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যও প্রদান করেছেন। তিনি যে সব তথ্য এখানে উল্লেখ করেছেন সেগুলো ইতিহাস-সমর্থিত। যেখানে তিনি তোষামোদ অথবা দৈব শক্তিকে আশ্রয় করেছেন, সেখানে ইতিহাস টাল খেয়ে গেছে। সে কালে প্রতারণাই ছিলো উচ্চ শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম; কৃষ্ণচন্দ্রও যে তার হাত থেকে

রেহাই পান নি বা রেহাই চান নি, সে কথা সভাকবির পক্ষে বলা নিরাপদ ছিলো না এবং তিনি বলেনও নি। ৯৪ পংক্তিতে রচিত 'গ্রন্থ-সূচনা' অংশে ভারতচন্দ্র, ক্ষমতা নিয়ে মুর্শিদাবাদে যে ষড়যন্ত্র ও লড়াই চলছিলো, তার একটি বিবরণমূলক চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিশটি পংক্তিতে কবি মুর্শিদাবাদ পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে। বাঙলার নবাবী কিভাবে সুজা খাঁ থেকে আলীবর্দী খাঁর বংশে পৌঁছালো তার চিত্রও এঁকেছেন ভারতচন্দ্র :

সুজা খাঁ নবাব-সুত সরেফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া ॥
ছিল আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিলেক যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥
তদবধি আলিবর্দ্দী হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা বাদশা খেতাব। ইত্যাদি[২৭]

বাঙলায় বর্গী-হাঙ্গামাও ভারতচন্দ্র চিত্রিত করেছেন এখানে। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যবন তথা মুসলমান শাসকদের দমন করার জন্যেই বর্গীদের আহ্বান করে নিয়ে আসা হয় বাঙলায়। কিন্তু তাতে হয় হিতে বিপরীত। কবি বলেছেন :

ক) সেই আসি যবনের করিবে দমন।

খ) বর্গি-মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রকৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত আকৃতি ॥
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥[২৮]

এই অরাজকতা যে মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য নগরকেও বিপর্যস্ত করে তার উল্লেখ স্পষ্টভাবেই করেছেন ভারতচন্দ্র। তিনি বলেছেন :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥[২৯]

কবি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'গ্রন্থ-সূচনা' অংশে নবাব, আমীর-ওমরাহ ও উচ্চবিত্ত মানুষের কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এঁরা সকলেই যে ছিলেন নগরবাসী এতে কোন সন্দেহ নেই। এই অংশে তিনি তিনটি নগরের উল্লেখ করেছেন : মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও কাশী।

'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশে নদীয়ায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর শক্তি ও শাসন ব্যবস্থার মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনাও আছে এখানে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে ভারতচন্দ্র রচনা করেছেন চারটি পংক্তি[৩০]। এ ছাড়া তাঁর বংশের বিভিন্ন সদস্যের এবং পারিষদ ও কর্মচারীদের নাম ও দায়িত্বের বর্ণনা দেওয়া আছে কবিতাটিতে। নিজ রাজধানীতে

কৃষ্ণচন্দ্র কি পরিবেশে ছিলেন তার চিত্র ভারতচন্দ্র এঁকেছেন এখানে সযত্নে। 'শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা' কবিতাটিতে কাশীর নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কাশীর মহিমা সম্পর্কে কবি বলেছেন :

দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টি যোগিনীপাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সারে এতক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান[৩১] ॥

এখানে যে 'শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত', দেবতা কিন্নর নর সবাই 'মোক্ষ-আশে' 'তপস্যা করয়ে'—এ সব উল্লেখ করতে ভোলেন নি কবি। 'ঋষিগণের কাশীযাত্রা' কবিতাটিতে নগর কাশীর আরও একবার উল্লেখ দেখা যায়। 'কাশীতে শাপ' কবিতাংশে নানা দৈবলীলা বর্ণিত হয়েছে। 'ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ' একই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এ সব কবিতার মূল ভিত্তি পুরাণভুক্ত নানা দৈবলীলা।

এ সূত্রে 'অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। দৈব-মহিমা-সংলগ্ন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নির্মিত পুরীর সঙ্গে কোন এক রাজার রাজধানী শহরে অবস্থিত রাজার পুরীর বাস্তব মিল থাকাই সঙ্গত। নগর ছাড়া অন্য কোন স্থানে এ হেন পুরীর অবস্থান বেমানান। কবি এক জায়গায় বলেছেন :

সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারিপাশ অতি সুশোভন ॥
তুলিলা পাতালে-গঙ্গা ভোগবতী-জল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া গড়িলা কমল।
চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িলা উৎপল ॥
নীলকান্ত দিয়া গড়ে মধুকর-পাঁতি।
নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি[৩২] ॥

বস্তুত, স্ফটিকের সাহায্যে ডাহুক, সারস, চক্রবাক, কাদা-খোঁচা-সহ নানা জাতের পাখি, 'চিতল ভেকুট রুই কাতলা মৃগাল' প্রভৃতি মাছ, 'আম জাম, নারিকেল জামীর কাঁঠাল' প্রভৃতি ফল, 'পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরীতকী' প্রভৃতি গাছ, 'ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কাসার' প্রভৃতি জন্তু এবং আরও অন্যান্য মূর্তি তৈরি করেন অন্নপূর্ণা। দৈবশক্তিসংযুক্ত বিষয়ের মধ্যে কোন ফাঁকে যে সমকালের জীবন ঢুকে বসে আছে তা কি কবি ভারতচন্দ্র খেয়াল করেছিলেন? তিনি একস্থানে বলেছেন :

বউ-কথা-কহ আর দেশের কি হবে।
বনশোভা যে সব পক্ষী কলরবে[৩৩] ॥

এই দেশ কি নদীয়া, না মুর্শিদাবাদ কিংবা বাঙলা? মুর্শিদাবাদ তথা নদীয়ার দরবার নাগর জীবনের জন্যে অনুকূল থাকলেও রুচিগত সমস্যা থেকেই যায় :

> সে যুগের নাগর-সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম এই জাতীয় দরবারকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠিত; এবং এই দরবারী জীবনের ছলাকলাময় পাণ্ডিত্য, রূপরস ও কলাময় কথা ও কাহিনী,

> শিল্পচাতুর্যময় কাব্য ও সাহিত্য এবং তাল, লয় ও ছন্দময় নৃত্য-গীতাদির আড়ালে ছিল জীবনের বৃহৎ ফাঁক ও ফাঁকি, যথার্থ মানবতার যে অপচয়, তাহা ঐ দরবারী জীবনের সূত্র ধরিয়া ক্রমশ: মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-কৃষ্ণনগর-নদীয়া ও কলিকাতার প্রশস্ত নাগর-জীবনের মধ্যে প্রসারিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই।[৩৪]

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাংশটিতে বর্ধমানের কথা আছে সবিস্তারে। ত্রিপদীতে রচিত 'সুন্দরের বৰ্দ্ধমান প্রবেশ' ছাপ্পান্ন পংক্তিতে রচিত একটি কবিতা এবং তৎকালীন, সম্ভবত ভারতচন্দ্রের কালের, রাজধানী তথা নগর বর্ধমানের কিছু বিবরণ তাতে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সেখানে গৌড়ের প্রশংসাও আছে। যেমন :

দেখি পুরী বৰ্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান।
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ[৩৫] ॥

বর্ধমান পুরীর চারদিকে 'সহরপনা'। এবং সর্বত্র :

কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের ছড়াছড়ি
সম্মুখে বাণের গড় হয় ॥

সেই সঙ্গে :

বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীরগুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠন্ঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥

উক্ত পুরীর ঢালী ও মল্লযোদ্ধারা শক্তিতে বলীয়ান। নদীবেষ্টিত (নদী জিনি) বর্ধমান গড়ের প্রবেশদ্বারে 'হাবসীর থানা' এবং —

যাইতে প্রথমে থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও ॥

এই কবিতাটিতে ভারতচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধভাবে স্মরণীয় প্রবাদও সৃষ্টি করেছেন যা কবিতাধৃত বিষয়ের সঙ্গে একই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন :

নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে

সমকালীন দরবার এবং চাকুরি-পরিস্থিতিও তিনি উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্তরূপে :

ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর-দ্বার
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি ॥

'বৰ্দ্ধমানের গড়বর্ণনা' কবিতাটিতে রাজধানীর বহু তথ্য দেওয়া আছে। প্রত্যেক গড়ে কাদের অবস্থান তাও নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম গড়ে কোলাপোষের আবাস : 'ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গী ফরাস'।

দ্বিতীয় গড়ে মুসলমানদের বসবাস : 'সৈয়দ মল্লিক শেখ মোগল পাঠান'। ক্ষত্রিয়রা থাকে তৃতীয় গড়ে, আর চতুর্থ গড়ে অবস্থান করে 'যত রাজপুত'। 'পঞ্চম গড়েতে থাকে যতেক মাহুত'। থানা ও মালখানা অবস্থিত ষষ্ঠ গড়ে। সুন্দর দেখতে পেলো :

সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাংশটির 'পুরবর্ণন' কবিতাটি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কোটালের থানা এবং ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ অর্থাৎ বহুসংখ্যক কারখানার উল্লেখ আছে এখানে। শহরের মধ্যভাগে রাজার মহল এবং মহলের 'চৌদিকে শহর'। সেই সঙ্গে আছে 'আট আট ষোল গলি বত্রিশ বাজার।' বাজারে যে অসংখ্য হাতী এবং ইরাকী, তুর্কী ও আরবী জাতের ঘোড়া ছিলো তারও উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে এতে। সেখানে আরও আছে :

ক) উট, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি পশু এবং অসংখ্য পাখি।

খ) বেদ-অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণগণ; তাঁরা চর্চা করেন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের।

গ) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় রত বৈদ্যরা।

ঘ) বেদে মণি গন্ধসোনা কাঁসারী শাখারী ॥
গোয়ালা তামুলি তিলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কুঁরী কামার কুমার ॥
. . . . . . . . . . .
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী ॥
কুমরী কোরঙ্গী পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর ॥

ঙ) পটুয়া, কসবী, ভাঁড়, নর্ত্তক, জটাভস্মধারী অবধূত।

চ) ডাহুক-ডাহুকী, সারস-সারসী, রাজহংস প্রভৃতির মনোহর সরোবরে 'খেলিয়া বেড়ায়।'

ছ) 'সুচারু পুষ্পের উপবন', ছয় ঋতুতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীতে সঙ্গীত চর্চার মধুর ধ্বনি।

বর্ধমান নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে ভারতচন্দ্র বলেছেন :

ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী ॥

এ বিবরণে অতিরঞ্জন হয়তো আছে। কিন্তু বর্ধমান রাজের হাতে তাঁর নিগ্রহভোগের পটভূমিতে সে অতিরঞ্জনের মাত্রা কতখানি ছিলো সেটা বিবেচনার দাবি রাখে। নগরটি যে ছিলো শোভাময় তা উল্লেখ করতে কবি ভোলেন নি :

দেখিয়া নগর শোভা বাখানে সুন্দর

মোগলদের দ্বারা বর্ধমানের জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়[৩৬]। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং উচ্চ বর্ণের মুসলমান ছাড়াও সদগোপরা ছিলো এর অধিবাসী। কৃষিই প্রধান নির্ভর এবং এই কাজে বামুনরাও অংশ

নিয়েছে[৩৭]। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, বর্ধমান রাজ্যের সর্বত্র কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিলো : ৩২০৩১, জমির পরিমাণ ৩৫৮৫১৬ বিঘা। রাজা ও তাঁর অনুমোদিত আত্মীয়দের অধীন বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্যও থাকতো[৩৮]। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বর্ধমান রাজত্ব লোপ পেতে থাকলেও মোগল আমলে এর শান শওকত কম ছিলো না। বার্ষিক ৬০০ টাকার ভাতায় নিয়োজিত রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই বর্ধমান রাজত্ব ও নগরের পরিচয় বিধৃত করেছেন তাঁর লেখায়। তবে, তিনি যে মূলত ছিলেন একজন কবি, এ কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য।

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ দেখাতে গিয়ে ভারতচন্দ্র পুরোপুরি ঐতিহাসিকতার পরিচয় দেন নি। ভবানন্দ মজুমদার, মানসিংহ ও জাহাঙ্গীর প্রসঙ্গে বেশ কিছু শহরের বিষয় তিনি উত্থাপন করেছেন। 'বর্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান' অংশে নদীয়া প্রসঙ্গ আছে; 'দেশ-বিদেশ-বর্ণন' অংশে মেদিনীপুর, রাজঘাট, কটক, ভুবনেশ্বর, বলেশ্বর প্রভৃতি নগর/শহরের কথা আছে। 'জগন্নাথপুরীর বিবরণ' অংশটি একই ধারায় উল্লেখ্য। এতে উল্লেখিত হয়েছে 'স্বর্ণময় পুরী' অযোধ্যা নগরী। 'মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি', 'দিল্লীতে ভূতের উৎপাত' প্রভৃতি কবির কল্পনাপ্রসূত। হিন্দু দেবদেবী ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে মোগল ও মুসলমানদের নিগ্রহ দেখানোর জন্যে এগুলো রচনা করেছেন ভারতচন্দ্র। মানসিংহের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যে আলাপ হয় তাতে দিল্লী নগরীর বিবরণ খুব একটা নেই। ভূতের উৎপাতের যাঁরা শিকার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান মিয়া, বিবি, কাজী, উজীর, নাজীর, আমীর, ওমরা প্রমুখ। ভারতচন্দ্র এক স্থানে বলেছেন :

মারা গেল কত শত আমীর ওমরা।

এই তথ্য সত্য হলে মোগল সাম্রাজ্যে বিপর্যয় ঘটে যেত। মোগলদের রাজধানী সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের জ্ঞান ছিলো সীমিত।

যথার্থ নগর বলতে যা আমরা বুঝি একালে, তা সর্বাংশে চিত্রিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে, এমন হয়তো বলা যাবে না। কারণ, আত্মপরিচয় এবং পৃষ্ঠপোষক-পরিচয় প্রদানের প্রয়োজনে সাধারণত তাঁরা অর্থাৎ কবিরা নগর/শহরের উল্লেখ করেছেন। কাহিনীর কারণে অনিবার্য হলেই কেবল শহর এসেছে তাঁদের লেখায়। কিন্তু এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যমূলকতার দ্বারা পরিচালিত হন নি বলে ঐতিহাসিকতা ও তথ্যনিষ্ঠা তাঁদের কাছে আশা করা যায় না।

তবে, প্রাচীন বাঙলায় যে বেশ কয়েকটি নগর/শহর ছিলো তা কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করেন নি। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' গ্রন্থেও এ বিষয়ে একটি আলাদা পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র**

১. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Dhaka, 1966, Text 10, p.30

২. 'এইরূপে তপস্বী, ধূমপান পরিত্যাগপূর্ব্বক, যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া, বারবণিতার সহিত, বিষয় বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, সম্পা. গোপাল হালদার প্রমুখ, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ.২

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব, কলকাতা '১৪০০, পৃ. ৩১০
৪. ঐ, পৃ. ৩০৮
৫. Muhammad Shahidullah, ibid, p. 32
৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ,* ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৩২১
৭. 'ওলো ডুমনী। তোর সনে করিব মুই সাঙ্গা।' Muhammad Shahidullah, Ibid, pp. 30-31
৮. ঐ, পৃ. ৩০
৯. ঐ, পৃ. ৩৯
১০. ঐ, পৃ. ৩০
১১. ঐ, পৃ. ৬
১২. আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে,* ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩-২৮
১৩. Muhammad Shahidullah, Ibid, pp. ৫৩-৫৫ : 'বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।'
১৪. ঐ, পৃ. ১১৬ (মরুমরীচি, গন্ধব্বনঅরী, দাপণ-পড়িবিম্ব জইসা)
১৫. ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭
১৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩-৩১
১৭. ঐ, পৃ. ২৬
১৮. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ২৭০
১৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
২০. আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪
২১. ঐ, পৃ. ২৭৩-৭৪
২২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
২৩. ঐ, পৃ. ২৮
২৪. নীহাররঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪-৯৫
২৫. মদনমোহন গোস্বামী, *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র,* কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ৩৪১
২৬. ঐ, পৃ. ৩৪২
২৭. বাকি অংশ :

কটকে মুরসীদকুলী খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দী খেদাইয়া দিল ॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দীর আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে ॥
লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ী তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক ॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর ॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া ॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বর করিলেক ধুম ॥

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সাহিত্য-মন্দির সং, কলকাতা, (অন্নদামঙ্গল) পৃ.৫

২৮. ঐ, পৃ. ৫

২৯. ঐ, পৃ. ৫

৩০. রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ।
পশ্চিমে সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গা পার ॥
(ঐ, পৃ.৭)

৩১. ঐ, পৃ. ৩০

৩২. ঐ, পৃ. ৩১

৩৩. ঐ, পৃ. ৩১

৩৪. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ*, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ১১

৩৫. *ভারতচন্দ্রের রচনাবলী*, বিদ্যাসুন্দর অংশ, পূর্বোক্ত পৃ. ৮

৩৬. Ratnalekha Roy, *Change in the Bengal Agrarian Society*, New Delhi, 1979, p. 89

৩৭. ঐ, পৃ. ৮৯

৩৮. ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭